BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110015

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

দুই সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমের দুই পরিণতি : বঙ্কিমের রোহিণী ও রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী

Abhilash Chatterjee

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi
Email: avilash4u@gmail.com

Abstract:

এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দুই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট দুই কালজয়ী নারী চরিত্র- রোহিণী (কৃষ্ণকান্তের উইল) এবং বিনোদিনী (চোখের বালি)-র অবদমিত বাসনা, সামাজিক বিদ্রোহ ও করুণ পরিণতির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে এই দুই বিধবা নারী যেভাবে তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও জীবনতৃষ্ণাকে বড় করে তুলেছিলেন, তা তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। আলোচনায় দেখা গেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর আধুনিক সত্তাকে উন্মোচিত করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে শারীরিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন, যা তৎকালীন নীতিবাদী সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেও তাকে বৈধব্যের আধ্যাত্মিক ও ত্যাগের আবরণে মুড়িয়ে কাশীতে নির্বাসিত করেছেন, যা এক প্রকার 'জীবন্ত মৃত্যু'র শামিল। প্রবন্ধে উভয় লেখকের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং সামাজিক সংস্কারের কাছে তাঁদের আপস করার প্রবণতাকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। পরিশেষে, রোহিণীর অকালমৃত্যু এবং বিনোদিনীর বৈরাগ্য -উভয়কেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Key Words: *রোহিণী, বিনোদিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, চোখের বালি, বিধবা জীবন, সমাজনিষিদ্ধ প্রেম, পুরুষতন্ত্র।*

Introduction:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রোহিণীকে ছকবাঁধা সামাজিক রীতিনীতি ভাঙার সাহস জুগিয়েছিলেন। রোহিণীর মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুনে দিলেও, শেষ পর্যন্ত লেখক নিজেই সম্ভবত নারীর সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। তাই সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনের শাস্তিস্বরূপ ঔপন্যাসিকের কলমেই রোহিণীর প্রাণতৃষ্ণা এক মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্রটিকে সৃজন করলেও, তাকে তার ব্যক্তিগত চাওয়ার পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও শুরুতে প্রথাগত সমাজকে উপেক্ষা করে বিনোদিনীর ব্যক্তিগত ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। বিধবা হয়েও বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি প্রেম কিংবা মহেন্দ্রর হাত ধরে অজানার পথে পা বাড়ানো ছিল সেই স্বাধীনতারই বহিঃপ্রকাশ। তবে বিনোদিনীর এই মুক্তির সীমা রবীন্দ্রনাথ ওইটুকুই রেখেছিলেন; এরপরই তিনি তার বাসনার রাশ টেনে ধরেন। শেষ বিচারে বিনোদিনীর পরিণতি বঙ্কিমের রোহিণীর মতো মৃত্যুতে শেষ না হলেও, তার গায়ে পুনরায় বৈধব্যের সাজ পরিয়ে কবিগুরু তাকে একপ্রকার জীবন্ত মৃত করে রেখে গেছেন।

Discussion:

স্থবির ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিধবা নারীদের ওপর যে কঠোর অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রোহিণী তার বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় বিদ্রোহী সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার আধুনিক মনস্তত্ত্ব প্রচলিত সমাজনীতির নিষ্ঠুরতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ব্যক্তি-মানুষের সহজাত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকেই বড় করে তুলে ধরেছে। একজন নারীর ভরা যৌবনে অকাল বৈধব্য যে অন্তহীন হাহাকার বয়ে আনে, রোহিণীর মানবিক চাহিদাপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়েই সেই চিরন্তন বেদনার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর এই অন্তর্যাতনার অসাধারণ বর্ণনাও দিয়েছেন উপন্যাসে-

> "...কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোনো দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী-মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী –তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী –কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ –আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক –পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই –কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?"[১]

রোহিণীর এই গভীর আক্ষেপের মূল কারণ কী? নিজের ব্যর্থ যৌবনের জন্য সে ঈশ্বর বা ভাগ্যকে অভিযুক্ত করেছে, কিন্তু আধুনিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে দেখলে এই অভিযোগের সার্থকতা কতটুকু? বর্তমান সময়ের যুক্তিবাদী মানুষের দৃষ্টিতে রোহিণীর এই করুণ পরিণতির জন্য নিয়তি নয়, বরং রক্ষণশীল সামাজিক কুসংস্কার এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোই দায়ী। মূলত নারীর অধিকার হরণের লক্ষ্যেই ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিধবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের অসারতাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই নিগড় ভাঙতেই রোহিণী তার মানবিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত হয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। তবে প্রচলিত সংস্কার ত্যাগ করে গোবিন্দলালের কাছে পৌঁছানো তার জন্য সহজ ছিল না। এই যাত্রায় তাকে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। একপর্যায়ে নিজের অন্তরের এই লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে সে আত্মহননের পথও বেছে নিয়েছিল, যদিও গোবিন্দলালের উপস্থিতিতে তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর সেই মানসিক সংকটের চিত্র অত্যন্ত নিপুণ ও কাব্যিক ভাষায় অঙ্কন করেছেন-

> "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায় ! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখ পড়িয়াছি – আমায় রক্ষা কর –আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও –আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি –তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার –আমার অসহ্য যন্ত্রণা –অনন্ত সুখ। আমি বিধবা –আমার ধর্ম্ম গেল –সুখ গেল –প্রাণ গেল –রহিল কি প্রভু? রাখিব কি প্রভু? –হে দেবতা –আমার প্রাণ স্থির কর –আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"[২]

প্রেমবিহ্বল রোহিণীর মনের ভেতরের এই লড়াই মূলত প্রথাগত সমাজ ও প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে। নিজের মনকে নানা যুক্তিতে শান্ত করার চেষ্টা করলেও, যখনই তার হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগের আয়োজন সম্পন্ন হয়, তখন তার চেতনা থেকে সমস্ত সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সংস্কারের ভয় নিমেষেই মুছে যায়। সেই মুহূর্তে সমস্ত লোকলজ্জার ঊর্ধ্বে উঠে সে কেবল তার নিজের হৃদয়ের হাহাকার আর গভীর ব্যাকুলতাকেই শুনতে পায়-

> "এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন। আমি আবার আসিব। ...আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না –কোথাও যাব না।"[৩]

-রোহিণীর এই মানস-বিশ্লেষণের গভীরে প্রবেশ করলে মনে হতে পারে, সে এক একনিষ্ঠ প্রেমিক সত্তা—যার কাছে গোবিন্দলালকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার অস্তিত্বের সমার্থক। তবে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর এই অসামাজিক প্রেমতৃষ্ণাকে নিছক কোনো সরল সমীকরণে আবদ্ধ রাখেননি। তাই উপন্যাসের অন্তিমে যখন রোহিণী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তখন কেবল বঙ্কিমের 'নীতিবাগীশ' রূপ বা সামাজিক সংস্কার রক্ষার তাগিদকে তার একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। লেখক তাঁর

নায়িকাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই জীবনাবসানের পেছনে রোহিণীর নিজস্ব চারিত্রিক দায়বদ্ধতা কতখানি আর ঔপন্যাসিকের দায় কতটুকু, তা নিবিড় পর্যালোচনার প্রয়োজন রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি নিছক নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন কিংবা সমাজ-সংস্কারের সুরক্ষা বলয় বজায় রাখতেই কঠোরভাবে ব্রতী হতেন, তবে রোহিণীর এই প্রথা-বিরোধী প্রেমের আখ্যান তিনি জনসমক্ষে কেন আনলেন? এই প্রশ্নের আলোকে যদি রোহিণীর অন্তিম পরিণতির রহস্য নতুন করে খতিয়ে দেখা হয়, তবে একটি ভিন্ন সত্য প্রতিভাত হয়। সমকালীন স্থবির সমাজ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে আধুনিক জীবনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রোহিণী পথে নেমেছিল, তার সেই করুণ মৃত্যুর জন্য বাহ্যিক শক্তির চেয়েও তার নিজস্ব সত্তার টানাপোড়েন কোনো অংশে কম দায়ী ছিল না। মূলত, রোহিণীর চারিত্রিক জটিলতা এবং তার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোই তাকে অনিবার্য বিনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর প্রমাণ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে রোহিণীর নিজে বক্তব্যেই উচ্চারিত হয়েছে-

> "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনো ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"[৪]

-এখানেই শেষ নয়, রোহিণী নিজের জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করে গোবিন্দলালকে বলেছে-

> "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।"[৫]

রোহিণীর সেই শেষ আকুতি গোবিন্দলালের কানে পৌঁছাল না; পিস্তলের নির্দয় শব্দে রোহিণীর প্রাণোচ্ছল দেহটি মাটির ধুলোয় মিশে গেল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কেন গোবিন্দলাল এই জীবনতৃষ্ণায় ভরপুর তরুণীকে হত্যা করল? এই রক্তপাত কি কেবলই ঔপন্যাসিকের পূর্বপরিকল্পিত ছক, নাকি এর নেপথ্যে গোবিন্দলালের নিজস্ব বিবেক ও বুদ্ধি সক্রিয় ছিল? যদি এই কাজের পেছনে গোবিন্দলালের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কাজ করে থাকে, তবে এর দায়ভার এককভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর চাপানো যায় না। এই জটিল পরিস্থিতি বুঝতে গেলে প্রেম ও ঈর্ষার মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভালোবাসায় যদি আস্থার অভাব ঘটে এবং প্রিয়তমার প্রতি সন্দেহের বিষ জন্ম নেয়, তবে তা যে কোনো চরম নৃশংসতা ডেকে আনতে পারে। শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' নাটকটি তার ধ্রুপদী উদাহরণ। সেখানে দেখানো হয়েছে, প্রণয়ের সঙ্গে যখন ঈর্ষার সংঘাত ঘটে, তখন তার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। 'ওথেলো'র দেসদিমোনা নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুচক্রী ইয়াগোর প্ররোচনায় ওথেলো তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। দেসদিমোনার মৃত্যুর জন্য যদি শেক্সপিয়রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো না হয়, তবে রোহিণীর করুণ পরিণতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রই বা কেন অপরাধী হবেন? উভয় ক্ষেত্রেই মূল ঘাতক হলো প্রণয়জাত তীব্র ঈর্ষা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রেমের টানে ঘর-সংসার ও সমাজ বিসর্জন দিয়ে নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেই প্রেমিকার প্রতিই তার মনে দুর্ভেদ্য অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতা দানা বেঁধেছিল। এর কারণও অবশ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যথারীতি বর্ণনা করেছেন-

> "রোহিণী ভাবিয়া থাকিতে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে –তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। ...রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।"[৬]

গৃহভৃত্য রূপচাঁদ রোহিণীর অভিসারের সংবাদ রাখলেও, তার মনের আসল উদ্দেশ্য নিশাকর রূপী রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত পাঠকদের কাছেও রহস্যাবৃত ছিল। নিশীথ রাতে যখন চারপাশ নিস্তব্ধ, তখন নিশাকরের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাতের জন্য রোহিণী অতি সংগোপনে গৃহত্যাগ করল। সে ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে, অন্ধকারের আড়াল নিয়ে গোবিন্দলাল ছায়ার মতো তার অনুসরণ করছে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে রোহিণীর মুখ থেকে যে উত্তরটি বেরিয়ে এল, তা পাঠকদের জন্য ছিল চরম বিস্ময়কর এবং অনভিপ্রেত। সে বলে-

> "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে ভুলিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"[৭]

এ কথা নিশ্চিত যে, রোহিণীর সেই সংলাপ গোবিন্দলালের কানেও পৌঁছেছিল, আর তার তাৎক্ষণিক প্রমাণ মেলে যখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে রোহিণীর কণ্ঠরোধ করে ধরে। এই একটি ঘটনাই প্রেমের ক্ষেত্রে রোহিণীর বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়। যে মানুষটি রোহিণীর আকর্ষণে নিজের বিশাল জমিদারি বিসর্জন দিয়েছে, এমনকি ফুলের মতো নিষ্পাপ ও সতী স্ত্রী ভ্রমরকেও বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছে, সেই প্রেমিকার মুখে গভীর রাতে পরপুরুষের কাছে এমন মন্তব্য শুনে গোবিন্দলালের হৃদয়ে ঈর্ষা আর প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলে ওঠা অতি স্বাভাবিক।

তবে এখানে একটি বিতর্ক থেকেই যায়- বঙ্কিমচন্দ্র কি কেবল সমাজ-সংসার রক্ষার দায়েই রোহিণীকে হঠাৎ এমন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিত্রিত করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ইতিহাসের পাতায় ফিরে তাকাতে হবে, যেখানে হরলালের স্বার্থসিদ্ধির দাবার ঘুঁটি হিসেবে রোহিণীর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। হরলালের কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়েই রোহিণী কৃষ্ণকান্ত রায়ের মতো প্রতাপশালী ব্যক্তির কক্ষে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিয়েছিল। কেন সে এই বিপজ্জনক চুরির ঝুঁকি নিয়েছিল? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেলেই রোহিণীর চারিত্রিক গভীরতা এবং তার পরবর্তী সময়ের 'বিশ্বাসঘাতক' হয়ে ওঠার রহস্য উন্মোচিত হবে। মূলত, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়েই হরলাল তাকে দিয়ে উইল চুরির কাজ করিয়েছিল। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর যখন হরলাল তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে 'চোর' বলে অপবাদ দেয়, তখন রোহিণীর তেজস্বী রূপটি প্রকাশ পায়। সে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, সে অর্থের লোভে নয়, বরং আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এই কাজ করেছিল। সেই মুহূর্তে হরলালের প্রতি ঘৃণাভরে রোহিণী বলেছিল-

> "কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? ...হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই।"[৮]

অর্থাৎ এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই যে, রোহিণী প্রলোভনের বশবর্তী হয়েই হরলালের নির্দেশে কৃষ্ণকান্ত রায়ের কক্ষ থেকে উইল চুরির ঝুঁকি নিয়েছিল। হরলাল যখন অর্থের বিনিময়ে রোহিণীকে প্রলুব্ধ করতে পারল না, তখন সে তার তুরুপের তাস হিসেবে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি সামনে আনে। সে জানিয়েছিল, বর্তমান সময়ের পণ্ডিতরা 'বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত' বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। মূলত এই সামাজিক স্বীকৃতির আশাতেই রোহিণী তার প্রভুর ঘরে সিঁধ কাটতে রাজি হয়েছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, জীবনের শুরু থেকেই রোহিণী তার বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে একজন পুরুষ সঙ্গীর সান্নিধ্য চেয়েছিল; সেই পথ শাস্ত্র মেনে চলল কি চলল না, তা নিয়ে সে খুব একটা চিন্তিত ছিল না। হরলালের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত হওয়ার পরেই সে গোবিন্দলালের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়, যার পরবর্তী পর্যায়গুলো ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রোহিণীর এই পুরুষ-নির্ভরতা কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। তাই রাসবিহারী ওরফে নিশাকরের রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে গভীর রাতে নদীর ঘাটে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ঘটনাটি কেবল ঔপন্যাসিকের সাজানো কোনো নাটক নয়; বরং এটি রোহিণীর নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার স্বাধীন কর্মেরই প্রতিফলন। এমনকি যখন গোবিন্দলাল তার দিকে পিস্তল তাক করে, তখনও রোহিণীর আচরণে তার দ্বিচারিণী স্বভাবের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে আধুনিকমনা রোহিণীর রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, তার মধ্যে অনুরাগের চেয়ে লালসা এবং প্রেমের চেয়ে রূপের মোহ ছিল অধিকতর প্রবল। এক অর্থে, রোহিণী আধুনিকতার এক বিকৃত মনস্তত্ত্বের প্রতিনিধি, যার কাছে হৃদয়ের সততার চেয়ে দেহজ কামনা ও যৌবনের উদ্দাম তৃপ্তিই ছিল মুখ্য। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল আধুনিকতাকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই রোহিণীর মতো এক রূপমুগ্ধ ও বিকৃত মানসিকতার চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—এমন ঢালাও অভিযোগ ধোপে টেকে না। উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি সমাজে রোহিণীর মতো রক্ত-মাংসের নারীর উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব ছিল না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় যখন রক্ষণশীল সমাজকাঠামোর ভিত আলগা হতে শুরু করেছিল, তখন সেই পরিবর্তনশীল সময়ে রোহিণীর মতো বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক—বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের মাধ্যমে আধুনিক পাঠকের কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে মূলত এটিই খতিয়ে দেখা হয়েছে যে, সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রোহিনীর করুণ পরিণতির পেছনে ব্যক্তিগত দায় কতটুকু, আর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা কতখানি। এই আলোচনার মাধ্যমে এটি পরিষ্কার হয় যে,

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানদণ্ডে গড়ে তুলতে চাইলেও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে আপস করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে এক 'কলঙ্কিনী' নারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের কঠোর অনুশাসনের মুখে দাঁড়িয়ে রোহিণী এক সাহসী ও প্রতিবাদী সত্তার নাম। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে এটি স্পষ্ট যে, সামাজিক অসংগতির চাপে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে রোহিণীর জীবনবোধকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তবে প্রকৃত প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করেই রোহিণীর অকালমৃত্যুর জন্য ঢালাওভাবে স্রষ্টাকে অভিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না; কেননা একজন কথাসাহিত্যিকের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সামাজিক সত্যকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরা। সেই নিরিখে সমকালীন সমাজে রোহিণীর তীব্র জীবনতৃষ্ণার কোনো স্থান বা স্বীকৃতি ছিল না -এ কথা ধ্রুব সত্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র সজ্ঞানে তাঁর নায়িকাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন? প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তেমন নয়; বরং কাহিনীর ক্রমবিকাশ আর ঘটনাক্রম রোহিণীকে এমন এক অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে মৃত্যু ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এছাড়া একটি রূঢ় বাস্তব এই যে, রোহিণীর প্রয়াণে পাঠকের মনে করুণার চেয়ে বরং এক ধরনের অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটেছিল, যা কাহিনীতে একপ্রকার স্থিতাবস্থা নিয়ে আসে। বিপরীতে, ভ্রমরের অকালপ্রয়াণ এবং গোবিন্দলালের বৈরাগ্য গ্রহণই পাঠকমনে অধিকতর বিষাদ ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পরিস্থিতির চাপে তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনীকে একই ধরনের স্খলন সত্ত্বেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তবে বিনোদিনী মৃত্যুদণ্ড না পেলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করেননি। তৎকালীন লোকাচার লঙ্ঘন করে এক বিধবা নারীর ব্যক্তিগত লালসা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার অপরাধে রবীন্দ্রনাথ তাকে বৈরাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছেন। বিনোদিনীর বর্ণিল সাজের পরিবর্তে অঙ্গে উঠেছে সন্ন্যাসিনীর গেরুয়া বসন, আর শেষ পরিণতি হিসেবে তাকে মহেন্দ্রর মায়ের সঙ্গী করে ধর্মচর্চার জন্য কাশীতে নির্বাসিত করা হয়েছে। অথচ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, মহেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের সময় বিহারীর দেওয়া বিবাহের প্রস্তাবটি বিনোদিনী অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল-

> "বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, 'ভুল করিয়ো না –আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে –আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজো তুমি তাই থাকো –আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"[৯]

অথচ, শৈশবে বৈধব্যের অভিশাপ বয়ে বেড়ানো বিনোদিনী মূলত একাকীত্বের জ্বালা সইতে না পেরেই জৈবিক তাড়নায় বিহারীর একান্ত কক্ষে উপস্থিত হয়েছিল। তবে তার চরিত্রের এই প্রবল জীবনতৃষ্ণা কেন পরবর্তী সময়ে স্তিমিত হয়ে এল, উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে তার কোনো সুনির্দিষ্ট বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রচনার গাঁথুনিতে পর্যাপ্ত কারণ না দর্শিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন বিনোদিনীকে গেরুয়া বসন পরিয়ে কাশী পাঠাতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। বিহারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও বিনোদিনীর হৃদয়ের লালসা বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কিন্তু নির্বাপিত হয়নি। বরং এরপর সে বিবাহিত মহেন্দ্রকে পাওয়ার নেশায় মত্ত হয় এবং সেই লক্ষ্য পূরণে সে চরম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করেনি। এমনকি সে মহেন্দ্রর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে এবং একই ছাদের নিচে বসবাসও করেছে। তবে মহেন্দ্রর প্রতি বিনোদিনীর এই আকর্ষণের মূলে প্রেমের চেয়ে আশালতার প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাই ছিল প্রবল। অকালে বৈধব্য বরণ করে নিজের জীবনের সব রঙ হারিয়ে ফেলেছিল বলেই সমবয়সী আশার দাম্পত্য সুখ ও সৌভাগ্য সে সহজে মেনে নিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এই অভাগিনী বিনোদিনীর নির্মম জীবনকথা প্রকাশ করেছেন এভাবে-

> "এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারির সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনিবন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে-লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যেই প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না। তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমানভাবে জীবনযাপন করিতেছিল।"[১০]

পরবর্তীতে, অসহায় বিনোদিনীর জীবনকাহিনী মহেন্দ্রের জননী রাজলক্ষ্মীর সেবানিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়েই সেই বিধবা নারীর অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান হয়। কলকাতায় পদার্পণ করার পর, মহেন্দ্র ও আশার সদ্য শুরু হওয়া বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার অবকাশ পায় সে। দম্পতি হিসেবে মহেন্দ্র ও

আশালতার এই গভীর প্রেম বিনোদিনীর মনের অবদমিত বাসনাগুলোকে নতুন করে উস্কে দেয়। ধীরে ধীরে তার অন্তরে হিংসার দহন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়ে লিখেছেন-

> "ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরে রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।"[১১]

অন্যদিকে দীর্ঘকাল রাজলক্ষ্মীর গৃহে আশ্রিতা রূপে থাকার পরও একবারও মহেন্দ্র যখন তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আগ্রহ দেখাল না, তখন একবার বিনোদিনীর মনে নারীত্বের ঈর্ষা জেগে ওঠে; ঠিক যেমন ঈর্ষা জেগেছিল বঙ্কিমের রোহিণীর হৃদয়েও। বিনোদিনীর ঈর্ষার স্বরূপ বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

> "বিনোদিনীও দুদিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, 'এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি, তখন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না। এত ঔদাসীন্য কিসের। আমি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই।"[১২]

বিনোদিনীর এই মানসিকতায় হিংসার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহেন্দ্রের দৃষ্টি তার ওপর পড়ল কি না, তা নিয়ে বিনোদিনীর বিচলিত হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়। বরং তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় একজন বিধবা হিসেবে নিজের রূপ-লাবণ্যকে পরপুরুষের নজর থেকে আড়ালে রাখাই ছিল তার নৈতিক কর্তব্য। অথচ বিনোদিনীর এই পরশ্রীকাতরতার ভেতরেই লুকিয়ে ছিল বিধবাদের জন্য নির্ধারিত সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার এক প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। পরিণামে, নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে সে প্রচলিত লোকচার ও অনুশাসনকে অবলীলায় তুচ্ছজ্ঞান করেছে। তবে তার এই বেপরোয়া আচরণের মূলে ছিল ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এক হৃদয়ের গভীর ঈর্ষাবোধ। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় তা নিম্নরূপ-

> "আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত – তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে-বেদনায় জাগরূপ করিয়া রাখিত, তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে-মহেন্দ্র তাহাকে সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কী বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দেবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।"[১৩]

বিনোদিনীর এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কেবল 'ঈর্ষা' হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননি। তিনি একে প্রেম ও বিদ্বেষের এক অভিন্ন সংমিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও, মূলত এটি ছিল বিনোদিনীর অন্তরের গভীর পরশ্রীকাতরতা -যার চরম পরিণতিতে সে আশালতার জীবন থেকে মহেন্দ্রকে কেড়ে নেয়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার পর বিনোদিনী তার প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই আকর্ষণহীনতার কারণ কী? এটি কি কাহিনীর এক স্বাভাবিক পরিণতি, নাকি কবির পূর্বপরিকল্পিত কোনো সিদ্ধান্ত? বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রোহিণীর মৃত্যুক্ষণকে অনিবার্য ও অকাট্য করে তুলেছিলেন, বিনোদিনীর ক্ষেত্রে সেই পর্যায়টি তেমন অমোঘ হয়ে ওঠেনি। একে বিশ্বকবির সৃজনশীল ব্যর্থতা বলা চলে না; বরং বিনোদিনীর চরিত্রে কামনার যে বীজ তিনি শুরুতে বপন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই ধারায় চরিত্রটির বিবর্তন ঘটাননি। লেখকের এই পদক্ষেপ যে অত্যন্ত সচেতন ও ইচ্ছাকৃত ছিল, তা বলা বাহুল্য। বস্তুত, বিনোদিনী নিজের এই ঈর্ষার কথা অকপটে বিহারীর কাছে স্বীকারও করেছে-

> "বিহারী : ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদনী : আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ সমস্তই আমার কাজ। আমি মন্দ হই যাই হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।"[১৪]

বিনোদিনীর এই স্বীকারোক্তির পর আর তাকে প্রণয়িনী হিসেবে আখ্যায়িত করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। যে-নারী ঈর্ষার জন্যই আরেক নারীর সংসার ভাঙে তাকে আর যাই ভাবা হোক না কেন প্রেমিকা ভাবার সুযোগ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসের সূচনা অংশে বিনোদিনীর এই ঈর্ষার কথা স্বীকার করেননি, তিনি বরং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঈর্ষাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে-

"চোখের বালি গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিৎ অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যখন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।"[১৫]

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবেই মহেন্দ্রের জননীর ঈর্ষাপ্রসূত জটিলতাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর মোড় পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আখ্যানের গতিধারায় বিনোদিনী চরিত্রটি এতটাই স্বকীয় এবং স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মহেন্দ্রের মায়ের চেয়ে বিনোদিনীর ব্যক্তিগত ঈর্ষাই বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে বিনোদিনীর ঈর্ষাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে লেখকের পরোক্ষ ইন্ধনও অনস্বীকার্য। মহেন্দ্রের সহধর্মিনী আশালতার সঙ্গে বিনোদিনীর তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে তিনি তার মনে নারীত্বের চরম আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলেছেন— 'আমি কি স্ত্রীলোক নই?'[১৬] নারীর এই শাশ্বত অহংকার যখন ধূলিসাৎ হয়, তখন তা তার অস্তিত্বের ওপর এক বিশাল প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। আর এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বিনোদিনী যখন সগৌরবে নিজেকে মেলে ধরেছে, তখনই আশার সাজানো সংসার এক গভীর সংকটের মুখে পতিত হয়েছে।

বিনোদিনী কোনোক্রমেই নিজের নারীত্বের মহিমায় সংসার অনভিজ্ঞ আশালতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারেনি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় একজন নারীর মধ্যে যে সমস্ত গৃহনিপুণতা ও গুণাবলি পুরুষেরা প্রত্যাশা করত, তার প্রতিটিই বিনোদিনীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায়, কেন সে পারিবারিক সুখ ও পুরুষসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকবে -এই প্রশ্নটিই তাকে বিদ্ধ করত। যদি প্রয়োজনীয় গুণাবলি না থাকা সত্ত্বেও আশালতা ঘর-সংসার ও দাম্পত্য সুখের অধিকারিণী হতে পারে, তবে বিনোদিনী অধিক যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন দুর্ভাগ্যের শিকলে বন্দি থাকবে? মূলত এই বৈষম্যবোধ থেকেই বিনোদিনীর অন্তরে দহনের সৃষ্টি হয়েছিল। সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত পুরুষদেরও যাচাই করতে চেয়েছিল যে, নারী হিসেবে তাদের কাছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন কতটুকু। প্রসঙ্গত এটিও অনস্বীকার্য যে, মহেন্দ্রের সাজানো সংসার তছনছ করার পেছনে বিহারীর নিকট থেকে পাওয়া প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভও পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল। কারণ, বিনোদিনী জীবনের সহজ ধর্মকে অস্বীকার না করে একদিন বিহারীর কাছে নিজের সমস্ত অনুরাগ উজাড় করে দিয়েছিল-

"...বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'ঐটুকো দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো ! একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"[১৭]

শুধু এ-কথা বলেই বিনোদিনী ক্ষান্ত হয়নি, সে কাম-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার প্রত্যাশায় আরো এগিয়েছে এবং সে-ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে জানিয়েছেন-

"বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ-বিহবল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই দুই হাঁটুর ওপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, 'জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তারপর আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা-কিছু দাও।"[১৮]

বিনোদিনীর উপরিউক্ত আচরণ বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে এক প্রবল জীবনবাদী নারী, যে নিজের অস্তিত্ব ও যৌবনের দাবিকে কখনও অস্বীকার করেনি। সে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত আশার চেয়ে বর্তমানের প্রাপ্তিতে বেশি আস্থাশীল ছিল। সম্ভবত এই কারণেই সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সে বিহারীর কাছে আত্মসমর্পণের এক সাহসী ও প্রত্যক্ষ প্রস্তাব রাখে। তবে বিনোদিনীর সেই আহ্বানের মূলে কেবল শারীরিক লালসা ছিল না; বরং সেই মিলনের মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করে নারীজীবনের পূর্ণতা পাওয়ার এক সুপ্ত বাসনাও সেখানে জড়িয়ে ছিল। সে বিহারীর কাছ থেকে এমন এক মুহূর্তের সান্নিধ্য চেয়েছিল, যা স্মৃতির মণিকোঠায় সে আমৃত্যু লালন করতে পারে। অর্থাৎ, বিহারীর সঙ্গে সেই মিলনের আকাঙ্খার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষাই প্রচ্ছন্ন ছিল।

বাইরে থেকে দেখলে একে কেবল কামনাবাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু 'চিরদিন মনে রাখার' এই আকুতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, সে ছিল মূলত মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীত্বের সার্থকতা খোঁজার এক আর্তি। অথচ জীবনতৃষ্ণায় উন্মুখ বিনোদিনীর এই ব্যাকুলতাকে সেদিন বিহারী আদর্শবাদের কঠোরতায় পাষাণ হৃদয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই চরম অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীর হৃদয়ে তীব্র ক্ষতের সৃষ্টি করে। নিজের নারীত্বের এই অবমাননা সে সইতে পারেনি; তাই বিহারীর সামনে নিজের রূপ ও আকর্ষণের ক্ষমতা প্রমাণ করতেই সে মহেন্দ্রকে প্রলুব্ধ করার পথে পা বাড়ায়। বলা যেতে পারে, বিহারীর এই কঠোর প্রত্যাখ্যানই বিনোদিনীর অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষাকে দাবানলের মতো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেদিন বিহারী যদি নীতিবাদের বশবর্তী না হয়ে বিনোদিনীর আর্তি গ্রহণ করত, তবে উপন্যাসের ঘটনাক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিণতির দিকে ধাবিত হতো।

যখন বিনোদিনী কাঙ্ক্ষিত অনুরাগ থেকে বঞ্চিত হলো, তখন তার বৈধব্যের সুপ্ত বেদনা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। সেই অন্তর্জ্বালা প্রশমিত করতেই সে আশালতার নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য সুখে অবিশ্বাসের বিষবাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর খেলায় যখন বিনোদিনী জয়ী হলো, তখনই এক অদ্ভুত বিস্বাদ তাকে গ্রাস করল- জীবনের প্রতি তার সেই তীব্র আকর্ষণ যেন নিমেষেই বিলীন হয়ে গেল। কাহিনীর এই সন্ধিক্ষণে এসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বিনোদিনীকে আর স্বকীয় সত্তায় বিচরণ করতে দিতে চাননি; কারণ বিনোদিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অহমিকা ধূলিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যে নারী এক মুহূর্তের ভালোবাসার জন্য সবকিছু বাজি ধরতে প্রস্তুত ছিল, মহেন্দ্রকে জয় করার পর সেই বিনোদিনীই যেন মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত এক মানসিতে রূপান্তরিত হলো। সে অত্যন্ত কঠোরভাবে মহেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করে বলে উঠল- "যাও যাও, তুমি এ বিছানায় বসিও না।"[১৯] প্রশ্ন জাগে, মহেন্দ্র কেন বসবে না? যে বিনোদিনী নিজের রূপ-যৌবনের মায়াজালে মহেন্দ্রকে তার ঘর-সংসার ও স্ত্রীর প্রতি বিমুখ করে তুলল, সেই একই নারী কেন এখন তাকে কামবাসনা চরিতার্থ করার নূন্যতম সুযোগটুকুও দিতে নারাজ- এর কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন-

> "মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচন্ড ঝড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিকড়-সুদ্ধ তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় আরো যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহার সম্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না।"[২০]

বিনোদিনীর এই বোধদয়ের চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নিগূঢ় সত্য উন্মোচন করেছেন—কেন সে মহেন্দ্রকে নিজের মোহে আচ্ছন্ন করেছিল। বিনোদিনী মূলত এক নীরব প্রতিবাদী রূপে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, পুরুষের মন ভোলানোর মতো সমস্ত নারীসুলভ লাবণ্য ও আকর্ষণ তার মধ্যে বিদ্যমান। তবে তার হৃদয়ে বিঁধে থাকা মূল কন্টকটি ছিল- এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও বিহারী কেন তার আহ্বানে সাড়া দিল না? বিনোদিনীর মনের এই দ্বন্দের সমাধান করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, বিহারী যদি সেই প্রেমকে সামাজিক স্বীকৃতি দিত, তবে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে বিধবাদের প্রণয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত; যা হয়তো সেই সময়ের সমাজ-কাঠামো ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ হতে দিতে চাননি। তাই কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে যখন বিহারী বিনোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে সাধারণ জাগতিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। তিনি তাকে এক প্রকার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শুচিতায় মণ্ডিত করে 'পবিত্রতায় স্নাত পদ্মের' মতো এক অনন্য উচ্চতায় স্থাপন করেন। ফলে বিহারীর বিয়ের প্রস্তাবকে সেই বিনোদিনী অনাদরে-অবহেলায় অবজ্ঞা করতে পারে খুব সহজেই-

"ভুল করিয়ো না –আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে –আমিও সমস্ত গৌরব হারাইবে। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজো তুমি তাই থাকো –আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"[২১]

প্রশ্ন জাগে, বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত কোন গৌরব রক্ষায় সচেষ্ট হলো? সমাজ-নির্ধারিত সেই প্রথাগত বিধবার জীবনাচরণ রক্ষার অহংকার কি সত্যিই তার কাম্য ছিল? রবীন্দ্রনাথ শুরুতে বিনোদিনীকে যে রক্তমাংসের ও আধুনিক মনস্ক নারী হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, কাহিনীর এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে যেন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর স্বার্থেই তার সেই বিদ্রোহী সত্তাকে বিসর্জন দিলেন। একজন নারী যখন প্রাচীন বৈধব্যের সংস্কার রক্ষার মাঝে নিজের সার্থকতা খুঁজে পায়, তখন তাকে আর আধুনিক চেতনার ধারক হিসেবে গণ্য করার অবকাশ থাকে না। যে বিনোদিনীকে মানবিক আবেগ ও কামনা-বাসনার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিকশিত করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে ধর্মের অনুগামিনী সাজিয়ে 'শ্রদ্ধার আসনে' বসিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, তার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়ে তাকে অন্নপূর্ণা কাকিমার সঙ্গী করে কাশীবাসী করা হলো। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনা কেবল এখানেই থমকে থাকেনি। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে পাওয়ার যে মোহগ্রস্ত বাসনা পোষণ করেছিল, সেই 'ভুলের' প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিনোদিনীর যাত্রালগ্নে সে সামনে এসে দাঁড়ালো এবং বলল-

"বৌঠান, মাপ করিয়ো। তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।"[২২]

যে-মহেন্দ্র কামনায়-বাসনায় একদা বিনোদিনীকে দৈহিকভাবে চেয়েছিল সেই বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ শেষাবধি এমন উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছেন যে তাকে মহেন্দ্রর মতো মানুষও সামাজিক কারণে শ্রদ্ধায় প্রণাম জানাতে বাধ্য হয়। বিনোদিনী চরিত্রের এই রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে দুটো কারণে ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-

(i) তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবা বিয়ের যে প্রচলন ঘটানোর আইনানুগ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, সে-প্রয়াসের বিরোধিতা করে সামাজিক সংস্কারকে বড় করে দেখা।

(ii) পুরুষবাদী মানসিকতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ একজন বিধবাকে কোনো বিবাহিত নারীর মতো সামাজিক যৌন অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতীয় সমাজের পুরুষতন্ত্র একমাত্র বিবাহিত নারীর যৌন অধিকার মেনে নিয়েছে; অন্যদের বেলায় তা গর্হিত অন্যায় বা মহাপাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যদিও ভারতীয় বিবাহিত পুরুষ অবাধ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে, এমনকি রক্ষিতা রাখারও সামাজিক স্বীকৃতি ছিল উনিশ শতকে।

Conclusion:

বিনোদিনীর কাশীবাসী হওয়ার মাধ্যমে মূলত জীবনবাদী এক নারীকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করে তার যৌবনের চাওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং পরিণামে বিনোদিনীর জীবন যে ব্যর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রর রোহিণীর মতোই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্কিমচন্দ্র পিস্তলের এক গুলিতেই রোহিণীর জীবনপিয়াসা জন্মের তরে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার চেয়েও বড় ও ভয়ংকর শাস্তি প্রদান করেছেন বিনোদিনীকে। রোহিণী মরে গিয়ে যৌবনের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ করলেও বিনোদিনী ভরা-যৌবনে কাশীবাসী হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করেছে আমৃত্যু। রোহিণীর তুলনায় বিনোদিনীর শাস্তিই যে গুরু হয়েছে তা একটু গভীরভাবে বিচার করলেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রর রোহিণীর সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত নারীই যে বিনোদিনী, তা নির্দ্বিধায় বলা যায় এবং বিনোদিনীর জীবনও পুরুষবাদী রবীন্দ্রনাথের হাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। রোহিণীর মৃত্যুর কারণে যদি বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচিত হন, তাহলে বিনোদিনীকে ভরা-যৌবনে কাশীবাসী করেও অন্যায় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই পুরুষবাদী মানসিকতারও সমালোচনা হওয়া দরকার।

Reference:

(১) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৬৩)। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ৫৪৯

(২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬১

(৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫৯

(৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯৫

(৫) পূর্বোক্ত

(৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯৩

(৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯৪

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৪৭

(৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৪৪)। চোখের বালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ২৯৩-২৯৪

(১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০

(১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪

(১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩

(১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬

(১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৬

(১৫) পূর্বোক্ত, চোখের বালি, সূচনা অংশ

(১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩

(১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯০

(১৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯০

(১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮০

(২০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮২

(২১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৩-২৯৪

(২২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৫

Citation: **Chatterjee. A.,** (2025) "দুই সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমের দুই পরিণতি : বঙ্কিমের রোহিণী ও রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.